কবির পাঠে জীবনানন্দ : সংবদী চেতনার স্বর

মুনিরা সুলতানা*

সারসংক্ষেপ:

তিনিরের 'আধুনিক' কবিদের মধ্যে জীবনানন্দ দাশ সর্বাধিক আলোচিত কবি। তাঁর কব্য-ভাবনা, কবিতার বিকাশ, সাহিত্যের সমালোচনা করেছেন সমকালীন ও উত্তর প্রজন্মের কবিরাও। জীবনানন্দ-সমালোচনায় একজন পাঠক-কবির অবলম্বন, অভিজ্ঞতা-একই সাথে অনুভব-নির্ভর কব্য উপভোগ এবং সচেতন-জগতের মনের পরিচয়। জীবনানন্দের কবিতার আবিষ্কারে কবিকৃত অনুসারে শেষপর্যন্ত কব্যসমালোচনাকেই সমৃদ্ধ করে। আলোচা প্রবেশ দে সমালোচনা-গীতিতেই প্রকৃতির নির্মাণের প্রায়াস রয়েছে।

আধুনিক কবিদের মধ্যে সবচেয়ে আলোচিত-সমালোচিত কবি জীবনানন্দ দাশ (১৮৯৯-১৯৫৪)। মৃত্যুর পরেই জীবনানন্দ ক্রমাগত বিস্তারিত হয়ে ওঠেন বাঙ্গাল ও আগ্রাজ্ঞিক সমালোচনায়ও। জীবনানন্দের কবিতাগুলোর সংখ্যা সাত, যার দেড় শতাধিক কবিতা মাত্র গ্রহণ করেছিল। বাঙ্গা সাহিত্যের আবিষ্কার অংশে পরিণত হওয়া তাঁর কবিতার সমালোচনার সংখ্যা অসংখ্য। সমকাল ও পরবর্তী কালের কবিরাও তাঁর কবিতাকে করেছেন আলোচা। প্রায় নয়কার বছর ধরে জীবনানন্দ দাশের আলোচনা-সমালোচনা চলছে। জীবনানন্দ দাশের সমকালে কিন্তু পরবর্তী প্রজন্ম ধরে কবিতা তাঁর কবিতাকে কীভাবে অধ্যয়ন করেছে সেটা যাচাই করে নেয়া যায় সমালোচক-কবির হৃদয়ে সূত্রে কিংবা কবিতা সম্প্রদায়ের তাঁদের নান্দনিকবোধ থেকে।

পূর্ব ও পশ্চিম উভয় বাংলার কবি, লেখক ও গবেষকদের মূল্যায়নেই জীবনানন্দ দাশের কবিতার অধ্যয়ন, অনুীকেন্দ্রণ পরিচয় স্পষ্ট। জীবনানন্দের কব্য আলোচনার শুরু যে বুদ্ধিদেব কসু (১৯০৮-১৯৭৪) করেছিলেন, পরে বহুবার এবং বিভিন্ন পর্যায়ে তিনি তা জানিয়েছেন। সমকালে বুদ্ধিদেব ছাড়া জীবনানন্দকে নিয়ে সবচেয়ে বেশি লিখেছিলেন কবি সঞ্জয় বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯০৮-৬৯)। এছাড়া বিভিন্ন সময়ে আলোচনা বা জীবনানন্দ বিষয়ে গ্রাহী রচনা করেছেন অরুণ মিত্র (১৯০৯-২০০০), অরূপকৃষ্ণ সরকার (১৯২১-১৯৮০), গুরুরাম বসু (১৯২১-২০০০), পূর্ণেন্দু পটেল (১৯৩১-১৯৯৭), শঙ্ক গোস্বামী (১৯৩২-)

*সহযোগী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।
২০২১), বুমেন্দ্র ওহ (১৯৩৩-২০১৫), অলকরাঙ্গন দাশগুপ্ত (১৯৩৩-২০২০), বিনয় মজুমদার (১৯৩৪-২০০৬), সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় (১৯৩৪-২০১২), দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯৩৬- ), শৈলেশ্বর ঘোষ (১৯৩৮-২০১২), বৃন্দাবেন ভট্টাচার্য (১৯৪৪- ), রগুনিং দাশ (১৯৫০- ), বীরেশ্বর ভট্টাচার্য (১৯৫১-২০১২), জয় গোস্বামী (১৯৫৪- ), জয়রঞ্জন মজুমদার (১৯৬০- ), মজুমদার মিত্র প্রমুখ। পঞ্চাশ থেকে ছয়টির দশকের অনেক কবিকর কবিতায় জীবনানন্দ দাশের প্রভাব স্পষ্ট; যেমন শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের (১৯৩৪-১৯৯৫) প্রথম কীর্তিকাল কবিতায়, এছাড়া বিনয় মজুমদার, ফরিদুর্দ্বী আচার্য, পরিত্র মুখোপাধ্যায় (১৯৪০-২০২১) প্রথমের কিছু কবিতাতেও।

সুলিখা কবিতা তাদের নিজস্ব কাব্যভাষা গড়ে তুলেছিলেন যদিও, তবে কোথাও কোথাও জীবনানন্দের প্রভাব লক্ষ না করে পারা যায় না। অনেকে ও কখনও অনিবার্য সে প্রভাব এড়াতে চেয়েও এক ধরনের ব্যাখ্যা কাজ করেছে বলে অভিমত প্রকাশ করেছেন কেউ কেউ। পঞ্চাশের বিশিষ্ট কবি তারাপদ রায় (১৯৩৬-২০০৭) লিখেছিলেন:

স্যার, বারান্দায় একটু অপেক্ষা করুন।

দুই লাইন লিখে নিতে দিন, একটু লিখতে দিন
আপনার উৎপাতে ঘড়া বায়ুবায় আছি।
আট বছর আপনাকার লাশকাটা ঘর থেকে রক্তমাখা ঠেটে প্রত্যেক রাজিতে কেন, প্রত্যেক রাজিতে
কোনো পরিচয় নেই, কোনো আত্মীয়তা নেই- কেন
আমার ঘরের মধ্যে কেন?

দয়া করে বারান্দায় অপেক্ষা করুন। (উইজার্ড, সুজিত, ১৪০১ : ১২৪)

বুদ্ধদেব বসু

কালের পুতুল গঠু জীবনানন্দ দাশকে নিয়ে রচিত প্রবন্ধ তিনটি। জীবনানন্দের
অধিকাংশ শ্রেষ্ঠ রচনাই বেরিয়েছিল 'কবিতা' পত্রিকায়। বিশেষত দুই সময় পাপালি কাব্যের
সিংহভাগ মুদ্রিত হয় এতে। যে দুই দশক থেকে 'প্রগতি'র বয়স তাই তাঁর স্রষ্টীয়
কাজ জীবনানন্দের কবিতায় পৃষ্ঠপোষকতা। জীবনানন্দ বিরোধ তাঁকে তিনি অত্যাব
সাহিত্যিক সঙ্গে প্রতিরোধ করেছিলেন; 'প্রগতি'র সম্পাদকীয় আলোচনার মধ্যে
জীবনানন্দের প্রসঙ্গ সমায়নিক অন্যদের তুলনায় বেশি পৌনঃপুরনী, যার অনেকটা
অংশই প্রতিবাদ, 'প্রগতি'র 'মাসিক' বিভাগে (১৩৩৪) বুদ্ধদেব লিখেছিলেন:
পত্রিকার সম্পন্নর কাজ খারা গ্রহণ করেন, তাদের হাতে একটি আনন্দপ্রদ কর্তব্য তার থাকে- সে হচ্ছে অত্যন্ত প্রতিষ্ঠা আবিষ্কার করা ও সাহিত্য-সমাজে তাদের পরিচয় করিয়ে দেওয়া। সাহিত্যিকের প্রতিষ্ঠা কার্যে পৃষ্ঠপোষকতার অপেক্ষা করা না বটে, কিন্তু আত্মবিস্মৃতির ক্ষেত্র না পেলে তা করিয়ে যেতে পারে।

গ্রেমেন্ড মিত্র ও বুদ্ধবদন বসু স্মরণ করেন যে, জীবনানন্দের প্রথম যে কবিতাটি তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে সেটি হচ্ছে ‘নীলিমা।’ জীবনানন্দের ‘নীলিমা’ যখন বের হয় তখন মাত্র সেতো বছরের বুদ্ধবদন (১৯২৫) দ্বারা একটি কলেজের প্রথম বর্ষের ছাত্র। কিন্তু তিনি সাহিত্য-সমালোচক হিসেবে তার চেয়ে দশ বছরের বড় অপরিচিত কবিকে আবিষ্কার করে সামনের সারিতে নিয়ে আসেন। জীবনানন্দ নিজে ‘প্রভাত’ পত্রিকার প্রতি তাঁর কৃতজ্ঞতার কথা জানিয়ে প্রভাকর সেন নামে এক মেহেমাহের মুখ-কবিকে জানিয়েছেন:

বুদ্ধবদন বসুর ‘প্রভাত’ এল নতুন সম্প্রদায় ও উৎসাহ নিয়ে। বাক্তিগতভাবে ‘প্রভাত’ ও বুদ্ধবদন বসুর কাজে আমার কবিতা চলে বেশি আশা নিয়ে উপস্থিত হয়েছিল। যে কবিতাগুলো হয়েছে বুদ্ধবদনের মতে আমার নিজের জগতের এবং তার ও পরিচিত পৃথিবীর বাইরে কোথাও নয়; স্পষ্টতাসম্বন্ধ তারা; অতএব সাহস ও সততা দেখার সুযোগ লাভ করে চরিতর্থ হলম— বুদ্ধবদন বসুর বিচারশিক্ষিত র হয়নি। বিধায় কবিতার জন্য বেশ বড়ো স্থান দিয়েছিলেন তিনি ‘প্রভাত’ এবং পরে ‘কবিতায়’ প্রথম দিক দিয়ে। (উক্তিতে প্রভাতকুমার, ১৯৯৯ : ২৫১)

জীবনানন্দের বক্তব্য যথাযথ; তাঁর জীবনের প্রাক্ষিন্ত ১৬৭টি কবিতার ১১১টি প্রকাশ হয় বুদ্ধবদন বসুর পৃষ্ঠপোষকতায়। বুদ্ধবদন প্রাথমিকভাবে জীবনানন্দকে চিহ্নিত করেছিলেন ‘প্রকৃত কবি ও প্রকৃতির কবি’ হিসেবে। এক হিসেবে সকল কবিই প্রকৃতির কবি একথায় মানলেও সমগ্র জীবনকে প্রকৃতির ভিতর দিয়েই গ্রহণ ও প্রকাশ করেন এমন কবিকেই বিশেষভাবে প্রকৃতির কবি বলেছেন বুদ্ধবদন বসু। অথবা একথা তাঁর মনে হয়েছিল, যখন ধূসর পাতুলিপি কাব্যগ্রন্থের রূপ পেল, যদিও জীবনানন্দের সমস্ত কবিতাই কোনো না কোনো অর্থে প্রকৃতির কবিতা বলে মনে করেন তিনি। ধূসর পাতুলিপি পড়তে পড়তে সমালোচক বুদ্ধবদন কবি জীবনানন্দের মৌলিক সৃষ্টিশীলতা ও নতুন কবিতার সমাহার পেয়েছেন। কবিতাগুলোতে তিনি আরও বাজে পেয়েছেন এক আদম অপূর্বতা, ‘মনে হয় এ বেশ সম্প্রদায় অথচ চিরকাল’ এই কবিতাগুলোর ছিলো সেই সূরের অনন্যতা ও অক্ষুন্ন। জীবনানন্দের কবিতায় এই সূরের সমীক্ষণ সৃষ্টির ব্যাপারটা বুদ্ধবদন বসু আগাগোড়াই উপলক্ষি করেছেন। এ কারণে বলেন, ‘তাঁর কবিতায় সেটি সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য বলে আমার মনে হয় সেটি— একটি সুর, আর-
কিছু নয়।' (বুদ্ধদেব, ১৯৯৭ : ৩৬)। অবশ্য কবিতা মুন্ত ছাড়া আর কিছু কি?
বুদ্ধদেবের প্রশ্ন। রবীন্দ্রনাথের প্রভাব না পড়া জীবনানন্দী কবিতাগুলোতে নিজের দৃষ্টি
ও সৃষ্টিশক্তি বিশ্বে সমালোচকের মত:

যে দৃষ্টিতে অতি সাধারণ অপরাপর হয়ে ওঠে, তুচ্ছকে ঘিরে গড়ে ওঠে মহিমামগল, সেই
দৃষ্টি জীবনানন্দ। ... হস্ত বুকাচোরা গতিতে, সূক্ষ ধরিতে ও বিরিতে,
পুনরুজ্জিতে ও প্রতিধরিতে মনে হয়, যেন এই কবিতাগুলি আঁকাবুকার জালের মতোই
ঘুরে-ঘুরে একা-একা কথা বলেছে। এদের আবহে আছে একটা সুদৃশতা ও নির্জনতা;
আমাদের পরিচিত পরিবেশ ছাড়িয়ে, এই আকাশ আর পৃথিবী ছাড়িয়ে অন্য কোনো
আকাশে, অন্য কোনো জগতে এক সম্পূর্ণ রূপকথা তিনি রচনা করেছেন। ... প্রকৃতির
নির্জন ও প্রচুর রূপের মধ্যে জীবনানন্দ তার রূপকথা সৃষ্টি করেছেন। (বুদ্ধদেব, ১৯৯৭
: ৩০-৩১)

এই সম্পূর্ণ ভিন্ন জাগতিক রূপকথা রচনার জীবনানন্দীয় পরিভাষার সাথে পাঠকের
রূপমূল্য বিহার কিংবা এ জগতের রস আশায় তখন অশ্লীল হলেও লাগিল। তাঁর কবিতা
পাঠকের তখনকার তাত্কস্ত্রীয় আধুনিক বাস্তবধর্মী সাহিত্যের মতো শব্দপীড়িত করেনি।
তাঁর কবিতা বুদ্ধদেবের মতে, অশ্লীল করে; কিছু কবিতা ‘বিশ্ব বর্ণনার অথবা
স্বীকৃতিভারূপ অনুভূমিক, নস্তলজিয়ায় পরাক্রান্ত।' (বুদ্ধদেব, ১৯৯৭ : ৪৯-৫০)
যেমন: ‘মূঢ়র আগে', ‘অবসরের গান', ‘হাওয়ার রাত', 'যাস', 'বনলতা সেন', 'নগ্ন
নির্জন হাত', 'নির্জন স্বথর', ‘১৩৩৩’ ইত্যাদি। অন্যথায় আছে- যেসব কবিতা
মননীয় শত্যনাথ অথবা দেবতার পরামর্শে লেখা, যেখানে লেখক বর্ণনার দ্বারা কিছু
বলতেও চেয়েছেন, যেখানে কবির আবেগ বাইরের জগতে প্রতিপ্রকাশ জুড়ে পেয়েছে,
চিত্তার সঙ্গে গ্র্হিত হয়ে আরো নিবিড়ভাবে জীবনের সঙ্গে সম্প্রূস্ত হয়েছে।' যেমন-
‘বোধ’, ‘ক্যাপ্পে’, ‘আট বছর আগের একদিন’। বর্ণনার ভঙ্গিকে শুরুতে দিয়ে
জীবনানন্দী কবিতার আরও কিছু ভিত্তি করেছেন সমালোচক বুদ্ধদেব বসু। তাঁর
জীবনানন্দ-সমালোচনার সংহারভাগ জুড়ে রয়েছে কবিতার শিখি-স্বৈরশ বিশ্বয়ক
পর্যবেক্ষণ। জীবনানন্দের বিচিত্র ও সাংকেতিকতায় উপমা, বিশেষণ ও ভাষা-প্রয়োগ
নিয়ে বৈতর্কিত ব্যবস্থা রচনার তাত্পর্য অনুভূত করলেও বুদ্ধদেব রচিত কলার পৃষ্ঠপ
সংকলিত তিনটি প্রবন্ধে রয়েছে নানা কবিতার আঘাত বা বিচিত্র ভাব। জীবনানন্দের
শিখি-প্রয়োগ; শিখি-ব্যবহারের নানা বৈশিষ্ট্য শনাক্ত করেছেন বুদ্ধদেব বসু। ১৯৫৫-এ
বুদ্ধদেব বসুর ‘কবিতা’ প্রকাশিত হয়েই এতে জীবনানন্দের তেজিত কবিতা প্রকাশিত
হয়। প্রথম সংখ্যায়ের ছাপা হবে মূঢ়র আগে' কবিতাটি। এ ছাঢ়া ছাপা হয়েছিল
তথ্যের মিশ্র, বিভিন্ন দেয়াল সম্বন্ধে বর্ণনার কবিতা। বুদ্ধদেবের ‘কবিতা’র
সংখ্যাটি রবীন্দ্রনাথের পাঠের হয়েছিল। প্রায় সকলটি কবিতার ওপর মতব্য করে পত্রের
(৩ অক্টোবর শাষ্টিনিকেতন থেকে বুধদেবকে লেখা রবীন্দ্রনাথের চিঠি) শেষাংশে জীবননন্দের কবিতা সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ লেখেন : ‘জীবননন্দ দাশের চিন্তারূপময় কবিতাটি আমাকে আনন্দ দিয়েছে।’ (উদ্ধৃতি, সমীর, ২০০৮: ৯৭)। আরও পরে, জীবননন্দের প্রথম ‘আত্মচারিক’ কবিতাগুলো ধূসর পাপুলিপি (১৯৩৬) পড়ে রবীন্দ্রনাথ তাতে লক্ষ করেছিলেন ‘তাকিয়ে দেখার আনন্দ’। রবীন্দ্র-উক্ত ‘চিন্তারূপময়’ অনুভূতি বিশেষভাবে বুধদেব বসুকে প্রভাবিত করে। পরবর্তী কালে বুধদেবের জীবননন্দ সম্পর্কে আলোচনাগুলোতে ‘নির্জনতার কবি’ ‘প্রকৃতির কবি’ অভিধানগুলো খানিকটা রবীন্দ্র-মন্ত্রে প্রভাবিত। বনলতা সেন সম্পর্কে রচিত প্রবন্ধে বুধদেব লিখেছেন– ‘তার বর্ণনা চিত্রবস্তু এবং তার চিত্ত বর্ণবস্তু।’ এছাড়াই ইস্ট্রিয়ের আলুগতে জীবননন্দ অতুলনীয় এবং রুপদানকারী তার চরিত্রকল্প বলে মনে হয় তার। বুধদেবের মতে, “গীত ও স্পর্শ দিয়ে অনেক অপরূপ অভিজ্ঞতা আমার সংগঠনী করি; কিন্তু এই দুই ইস্ট্রিয়ের অনুভূতি জীবননন্দের মতো এত পূর্ণমাত্রায় আমাদের আর কোন কবি ব্যবহার করেছেন জানি না।” (বুধদেব, ১৯৯৭: ৩২)। জীবননন্দের কাব্যে রোমাঞ্চকাতর রোধ বিষয় হিসেবে মৃত্যু প্রসব এবং কবিতার বর্ণনার ভঙ্গির বিচার করেছেন বুধদেব। জীবন-প্রত্যয়ের সমস্ত উপকরণ সংগঠন এবং সূচনা চিত্রিত তা শান্তি ও পরিপূর্ণ করে নিয়েছেন জীবননন্দ।
কবিতা-পর্যালোচনায় বারবার জীবনের সমভাবনকে খুজে নেয়া এই কবির কিছু কবিতা পুনরায় পাঠের প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করেন বুধদেব বসু।
কাব্যবোধে বুধদেব বসু অনুভূববাদী; তিনি ওইসব কবিতাকেই মূল্যবান মনে করেন যা তাঁর মনে দোলা দেয়। তিনি কবিতার মধ্যে জীবননন্দের পঞ্চনিমালা তাঁর সমর্পণকারী হয়েছে সবাইকে আনুভূতির করেছিল। আর জীবননন্দ প্রসঙ্গে কালের পুতুল গ্রহণের তিনটি প্রবন্ধে তিনি যা বলে গেছেন, এ যুগের সমালোচনকারী কবি সম্পর্কে এর ব্যতিক্রম কিছু সৃষ্টি করতে পেরেছেন কি? জীবননন্দ সম্পর্কে বুধদেবের সমালোচনা কিংবা উদ্ভটির সুরবর্ধন অঙ্গ পাঠকদিগে সংজ্ঞায়িত হয়ে যায়। কবিতার অনুভূত ও সংবদনশীলতায় আর এক কবির গত তোলা রূপক-কে তিনি করেছেন আরো রূপময়, তথাকথের পরিণত করেছেন সৌন্দর্যে। এটি বুধদেব বসুর সাহিত্য সমালোচনার এক অন্যান্য ও অভ্যন্ত ভঙ্গিমা।

পূর্বেন্দু পত্রী

নির্জনতার কিংবা শুদ্ধতার কবি হিসেবে কেবল নয়, একাদের নবীন পাঠকের অভিজ্ঞতায়
কবি পূর্বেন্দু পত্রী (১৯৩১-১৯৯৭) চিনে নিতে চান জীবননন্দ দাশকে; যিনি রূপসী
বাংলার পাশাপাশি লিখেছেন মহাপৃথিবী, সাতটি তার তিনি-এর মত কাব্যগ্রহণে। বিশ্বচ্ছন্ন প্রকৃতির নির্জনতম উপাসক নন তিনি, কবির আত্ম-প্রসারণের ভিত্তির যাত্রা, পৃথিবীর পথে তাঁর ক্রমিক রূপান্তরিত জীবন-অষ্টময় চলেছে। ফলে, “নির্মমতম বায়ুতের রণের কে আলোড়িত ঐতিহাসিক সময়ে ইতিহাসের দুঃসহ দাহেক সরিয়ে দিতে পারেন নি তিনি?” (পূর্বে স, ১৪০১ : ২৫৮)। মহাপৃথিবীর ‘হাওয়ার রাত’ পড়তে পড়তে কবি পূর্ণদু পত্রী আবিষ্কার করেন তাঁর কিংবা আমাদের’ জীবনানন্দ পাঠে। কবির (জীবনানন্দ) বাচনিক অভিজ্ঞতা পরিতৃপ্ত করে এ-কালের কবি-পাঠককে। সমালোচনায় সুপ্তিত হয় কবিরই নির্মাণে:

... (পূর্বে স, ১৪০১ : ২৬১)।

পূর্ণদু পত্রী তাঁর রূপসী বাংলার দুই কবি (১৯৮০) প্রবন্ধচ্ছে অনন্যনাথ ঠাকুরের (১৮৭১-১৯৫১) সাথে জীবনানন্দ দাশের (১৮৯৯-১৯৫৪) তুলনামূলক আলোচনাও করেছেন।

শঙ্ক ঘোষ

‘সৃষ্টি কাজে কবির একাকীত্বের সামার্থ্য অনুসন্ধান’ করেছেন শঙ্ক ঘোষ (১৯৩২-২০২১) তাঁর ‘সময়ের সমগ্রতা’ প্রবন্ধে। দাতের বিষয়ে একটি লেখায় জীবনানন্দের কবিতার লাইন ব্যবহার করেছিলেন বলে কোনো এক মার্কসবাদী বন্ধুর কাছে বিকারে শুনতে হয়েছিল তাঁকে। বামপথী কবির কাছেও জীবনানন্দের কবিতা তেমন মূল্য পায় নি কখনও। সুভাষ মুখোপাধ্যায় (১৯১৯) লিখেছেন:

... সমস্ত কিছু মধ্যে তেমন কিছু মধ্যেই নন, সেই ভাবাত্মক কবি হলেন জীবনানন্দ দাশ। সমস্ত কিছু দূঃসহ দূঃসহ দেখেছেন আমি তার পরে একের পর এক তাদের মুখগুলো ধূলো ক্ষুধায় মৃদু দেখে। নাম, সংখ্যা, আকৃতি- তাঁর কাব্যের কথায় মাত্র। প্রাকৃত থেকে অপ্রাকৃত, আকার থেকে নিরাকার। তাঁর যাত্রা। সমস্তের কষ্টপূর্ণ করে তিনি কথা বলেন, শব্দ তাঁর কাছে বস্ত্রনির্ভরীত সংকেত মাত্র। বিপরীত
ভাব গায়ে গায়ে জুড়ে তিনি তাদের ঘর পাড়ান, তারপর নিজেই নিয়তিপূর্ণ চেষ্টা করে এক ফৌরে সে ঘর উড়িয়ে দেন। (সাহিত্যমেলা : বিভাগীয় পূর্ব-পশ্চিম বাংলার সাহিত্য, ১৩৫৪-১৩৫৯, ক্ষীরশ রায় সম্পাদিত, শাক্তিনিকেতন, উদ্ধৃত, শাহাবুদ্দিন, ২০০১ : ২১৯-২২০)

জীবননদের ঘিরে প্রগতিশীলদের এ রকম প্রত্যাখ্যানের নতুন ব্যাপার নয় সমকালেও। কবির কাছ থেকে দেখে সমাজ-পাঠক কী পেয়েছে—এই অবস্থানের চেষ্টা রেণ্য দাশগুপ্তের নিজের মনে অনেক মাল্যবাদী করেছেন। শঙ্কা ঘোষ এ জিজ্ঞাসায় জবাব দিয়েছেন গভীর নিরূপেক্ষতার সাথে—আর আত্মসম্বন্ধে অনুসরণের যে পথ কবির থাকে; সেখানে তিনি পেয়েছেন 'অদম্যতা আর আত্মস্বার্থ শিক্ষায় নিজের কাছে পৌছেতে পারবার আশায়।' (শঙ্কা, ২০১০ : ৫৪)

জীবননদের “কবিতায় আদান এক 'না'” (শঙ্কা, ২০১০ : ৫৫) ছড়িয়ে আছে বলে সমাজের কিংবা পাঠকের কাছে মৃত্যুর, বাধার, নিরাধারের, ক্ষতির কিংবা ক্ষয়ের কবি হিসেবে তার একটি সহজ পরিচয় তৈরি হয়ে আছে। শঙ্কা ঘোষ একতরফা রূপে খিল-ক্ষতীর্পী কবিকে পাঠ করতে চান নি। চিত্রকর্মে বিচিত্রতায় অপার অস্তিত্বেরই মত; কিন্তু ক্রম-সংগঠিত সময়চক্রেতনা, জীবন-মন্দ্ব আর সমস্ত নিধনবিশেষে অভিভাবক প্রাপ্তি কবির চেতনায়নের স্বত্ব সমাহিতিই নির্দেশ করে। কিংবা এই প্রক্রিয়াটি কবি শঙ্কা ঘোষ ব্যাখ্যা করেন কবিসের সমগ্রতার উদ্দেশ্য হিসেবে:

জীবননদের অস্ত্রা নিয়ে বিষয়, আর তার হাতে পাওয়া অনেক দানের জন্য তার মৃত্যু, প্রকৃতির মধ্যে সীমান হয়ে যাবার আবেশ আর ইতিহাসের হোটের মধ্যে নিজেকে বুঝতে চাওয়ার সংক্ষিপ্ত, এর মধ্যে চলচ্চিত্রের একটি পথ যে আছে তার কবিতায়, সে-পথ হয়ে যে খুব সরল চলে এগোয়। এর থেকে অনেক যে শুধু এক নিদর্শন অতিমুখী। জীবননদের কবিতা-পাঠককে জেনে নিতে হয় সামগ্রিকের ওই জটিলতা। (শঙ্কা, ২০১০ : ৫৬)

কবিতায় ব্যক্তিকাল আর মানবকালের খুঁ ও অখন সময়-প্রবাহ এবং সময়ের সমগ্রতার বোধের রূপটিও অস্বীকার করেছেন সমালোচক। মানুষ, মানব, প্রকৃতি, সমাজ, ইতিহাস, সময়ের সাথে ব্যক্তির অস্ব-আদর্শের প্রকৃতি অনুসারণকে কবিতা সৃষ্টি আর কবিতা পাঠের সাথে ই সামগ্রিক পূর্ণ একটি জিজ্ঞাসা হিসেবে গ্রহণ করতে চান শঙ্কা ঘোষ। আত্মবিশ্বাস নিমিত্ত হয় ব্যক্তিকাল, মানবকালের আর বিশ্বকালের সম্পর্কের মধ্যে, আত্মাত-প্রত্যাখ্যাতি কিংবা দ্বন্দ্ব-সমস্যায় এই সম্পর্ক যেখানে জড়িয়ে মেটে থাকে আমাদের সমাজ-ইতিহাস আর প্রকৃতি-কবিতা সৃষ্টির পথে এই সবকিছুর সাথেই এক অভিভাবক সম্পর্কে জড়িয়ে যায় কেউ কেউ। শঙ্কা ঘোষের মতে, “সেই সবকিছুর-ই ইঙ্গিত দেন
জীবনানন্দ, যখন তিনি বলেন ‘মহাবিশ্বের সত্যের মতো’ কিংবা যখন ‘মানব সমাজকে প্রকৃতি ও সময়ের শোভাভূমিকা’ দেখতে চান কিংবা বলেন, “প্রকৃতি, সমাজ ও সময় অনুধাবন’-এর কথা। ... এক চেতারের জল অন্য চেতারের মধ্যে গড়িয়ে যায় যেহেতু, অচিহ্নিত মিশে যায় ওপরোপারো, জীবননদের কবিতায় সমগ্র-সমস্ত এই ‘কাল’ (মানবকাল-বিশ্বকাল-ব্যক্তিকাল) তেমনি জড়িয়ে যায় ভিতরে ভিতরে। আর সেই জন্যই ‘সমাজের মধ্যে প্রকৃতি, জীবনের মধ্যে মৃত্যু, ভরসার মধ্যে নিরাশা একযোগে গলে মেরে থাকে তাঁর কবিতায়, তার কোনো একটিকে আলাপ করে দেখার কোনো মানে থাকে না আর।” (শঙ্ক, ২০১০ : ৫৮)।

আবহামান সময়ের প্রশস্তি কিংবা, জীবনের সঙ্গে কবর সরবরাহকারের মিশে থাকবার ধরনটিকে শঙ্খ ঘৌষ গুরুর দিয়েছেন অনেক বেশি, আর নির্দোহ করেছেন বিশেষ কোনো ব্যক্তিত্ব কবর করে জীবননদের কবিতা পাঠ করতে। কারণ আমাদের অভিজ্ঞতার সর্বকিছুকেই দ্বিকোটিতে সাজিয়ে দেখাবার অভ্যাসে বিভ্রমিত হয় কবিতার অন্তর্গত সামগ্রী বোঝার ক্ষমতা। “সেই বিভাজন থেকে দূর সরিয়ে নিয়ে এমন একটা জগৎ তৈরি করে তোলেন জীবননদ যেখানে একই সত্য পেয়ে যায় জীবনের মধ্যে মৃত্যু, আশার মধ্যে নিরাশা, সংঘারের মধ্যে স্পৃহা; যেখানে ‘অস্তিত্ব বেদনার সাথে রয়ে গেছে আমোস আমোস’। আর এই অত্যাচার জগৎ থেকেই তৈরি হয়ে ওঠে আমাদের সত্যের পরিচয়।” (শঙ্ক, ১৪০৫ : ৫২০)। সুতরাং সময়ের যে ‘আমোস সম্প্রতি’ কাছে আসে আস্তে আস্তে সম্পর্ক করেছিল ‘মাতালাসার মন’ (শঙ্ক, ২০১০ : ৫৯) শঙ্খ ঘৌষের জীবননদ-পাঠও সেই সামাজিকতার খোজে অন্তর্দীপিত এক কবি-মনের অঙ্গীকার হয়ে ওঠে।

অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত

অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত (১৯৩৩-২০২০) জীবনানন্দ (১৯৮৯) প্রসঙ্গে একটি সমৃদ্ধ সমালোচনায়। ‘মাটিকের ছাঁদশায় ও তারুণ্যের স্পর্থায়’ জীবননদের তৎকালীন প্রকাশিত কবিতাগুলোকে নির্ব্বাক্ত আখ্যা দিয়েছিলেন কবি অলোকরঞ্জন এবং পরবর্তী সময়ে জীবননদের মৃত্যুমৃত্যু হওয়া এবং ‘কবিতার পুরো ব্যাপার’ নিয়ে পরিপূর্ণ গ্রন্থ রচনা বিষয়ক স্থিরচীহর তিনি জীবননদ গ্রন্থের মূলীকোপ করেছেন। সাঙ্গীতিক বদুমাত্রি ভাস্কর মিত্রের অনুরোধে জীবননদের ‘কবিতার অন্তর্গত গানের দিকটাও’ (ভাস্কর মিত্রের স্বরূপ অনুপ্রাণিত) তোলেন নি অলোকরঞ্জন, ফলে কবির হাতে লেখা এ গ্রন্থ হয়ে ওঠে সুরের অর্ববে কবিতার নান্দনিক সমালোচনা-চিত্র। যদিও ‘অন্তর্গত নান্দনিক ও গুণ্ড অ্যাকাডেমিক, এই দুই ধারার মানুষজনের কাছেই বিবেচিত হতে পারে’ এরকম একটি গ্রন্থ লিখেছেন কবি। কবি হিসেবে জীবননদের নিম্নলিখিত, নির্জনতার ব্যাখ্যায় অলোকরঞ্জন লিখেছেন:
বিবির পাঠে জীবননন্দ : সংবেদী চতুনার স্বর

কবিতা রচনার জন্য কবিকে পদ্ধতিগত এক ধরনের দূরস্থতা, একরকম অন্তর্বাসের
প্রাতিভাসিক বৃহৎ, নির্মাণ করে নিতে হয়, নানানিক সেই বোধ থেকেই তিনি
নির্দেশনাতে অস্বীকারের মতন ব্যবহার করেছেন। কিন্তু কবিতা-সংক্রান্ত তার স্বতন্ত্র
কথিকাগুলি পড়লেও দেখা যায় 'স্মাজ' শব্দটি তার চিন্তা ও চেতনায় কিছুকিরকম বিপুল
প্রাধান্য পেয়েছে। (অলকারশ্রী, ২০০৭ : ১১)

ভাষার অনুর্গত অথচ অতিশয়ী শফ্তির পরামর্শ মুক্তির ক্রমগুলোচনের রহস্যময়তা'
(অলকারশ্রী, ২০০৭ : ২৬) জীবননন্দের কবিতার অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

সুনীল গঙ্গাপাধ্যায়

শৈশব থেকে রেল জীবন পর্যন্ত বেড়ে ওঠার সৃষ্টিতে জীবননন্দের নাম কথাই
উচ্চারিত হত বলে মৃত্যুরমূলক প্রবণ আমার জীবননন্দ আবিষ্কার'-এ লিখেছেন
সুনীল গঙ্গাপাধ্যায় (১৯৩৪-২০১২)। খ্যাত আধুনিক কবিতা কাহারোই যেন ছিল
kেনও গোপন সম্প্রদায়ের নিজস্ব সাধারণ কথার পরের মতন। (সুনীল, ২০১৫ :
১৬)। জীবননন্দের কবিতা প্রথম পত্র পর 'বিমূচ্ছ, স্বল্পত হয়ে বসে থাকা',
'মন্ত্রিতাত্ত্বিক' ইত্যাদি প্রতিক্রিয়ার কথা মৃত্যুর মূলে লিখেছেন সুনীল; আর
ঠিক যে অর্থে কবিতার পাঠ এই রহস্যময়তায় অনুভব, তা 'শ্রুতি কবিতারই নির্মাণ' বলে
উল্লেখ করেছেন তিনি। ধূসর পাটুলিপি পাঠে শেষে জীবননন্দের ভাবার্থতি কিংবা শদ্ধ-
স্বরের স্বাভাবিক বোঝাতে সুনীল লিখেছেন-

এমন আবেশময়, এমন মায়াবী কবিতা পাঠ যেন জীবনের শ্রষ্টি উপহার মনে হয়েছিল
সেই স্বপ্নে। ইংরেজি 'সেনসুয়াস' শব্দটি যেন এই রকম কবিতা সম্পর্কেই স্থিত
ব্যবহার করা যায়। ... জীবননন্দ দাশ কখনও উচ্চতমভাবে রবীন্দ্র-বিবিধিত
করেনি। কল্পনার অন্যান্য কবিতা যতই চাহিয়ে করলেন, তারা রবীন্দ্রনাথেরই
নামধ্যবিধ উদ্ধনসূত্র। কিন্তু জীবননন্দের ভাবার্থতির রবীন্দ্রনাথ থেকে অনেক দূরের।
ফসলের নতুন থেকে ফোঁটা ফোঁটা শিশিরের জল পড়ার বর্ণনা লেখার সাধ্য ছিল না
রবীন্দ্রনাথের। (সুনীল, ২০১৫ : ১০)

বুধবার বসু জীবননন্দকে নিয়ে প্রথম প্রবন্ধ লিখেছিলেন, তবে তরণ্তম কবিদের
মূখপত্র 'কৃত্রিম' (১৯৫৩) 'প্রথম প্রকাশে' জীবননন্দকে নিয়ে একটা হিচাই শুরু করে।
(সুনীল, ২০১৫ : ১০)। 'প্রজ্জুল্লা সূর্য এবং সাতটি তারার তিমির' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথের
সাথে জীবননন্দের তুলনামূলক আলোচনা করেছেন সুনীল এবং জীবননন্দের কবিতা
বিবেচনায় তাঁর চরিত্রে- কেবল রবীন্দ্রনাথেরই নয়, সমসাময়িক কবিদের থেকেও দূরে
জীবননন্দের কবিতার অঙ্গিক। রবীন্দ্রনাথ কথিত 'চিত্রপূর্ণ' অনেক কবিতার পথের
আলোচনা হয়েছে রবীন্দ্রনাথের পুনর্ভাব, শেষ সংক্রান্ত, পরপূর্ব, শ্যামলী, আকাশ প্রায়,
নবজাতক, সানা/ই ইত্যাদি কাব্যপ্রেমীর বিভিন্ন কবিতার সাথে। সুনীলের মতে, 'পুনর্ব' পর্বে ছদ্মকে বর্জন করে গদ্যকে কবিতার ভাষার উপযোগী বলে যে ঘোষণা করেছিলেন, পরে তার অসারতা বুঝতে পেরেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। সেই সাথে আধুনিকতা মানেই বাস্তবতার বুৎপত্তি বর্ণিয়ে নিয়ে বাড়বড় নয় কিংবা আধুনিকতা মানে শুধুই বাস্তবতা নয়, সেটাও সম্প্রতি করেছেন তিনি।

আধুনিকতা মানে শুধু বাস্তবতা নয়, তা ক্ষেপে ক্ষেপে পৌঁছে যায় পরাবাস্তবতায়। অনুভূতির নানান স্তর এসে পড়ে সেখানে। পশ্চিমী দেশগুলির চিত্রিতকরিক বিবর্ধনে দেখতে পাই, অনেক শিল্পী অতুল্য সাহে পরাবাস্তবতার স্তরও পেরিয়ে যেতে চেয়েছেন সম্পূর্ণ বিমূর্ততায়, যার ফল সুখকর হয়নি। সম্পূর্ণ বিমূর্ততায় সৃষ্টির সঙ্গে দর্শন-পাঠকদের যোগাযোগ ছিল হয় যায়, সৃষ্টির উদেশ্যই নষ্ট হয় তাতে।... জীবনানন্দ দাশ তা আঁচেই বুঝেছিলেন। তাই তার কবিতা কখনও বাস্তবচূড়ান্ত নয়, মাঝে মাঝে বিমূর্ততার ছায়া এসে রহস্যের বাতাসের দিলেও আবার ফিরে আসে চেনা জগতে। তাই পাঠককে বিমূৰ্ত্ত করে না। (সুনীল, ২০১৫ : ২১)

জীবনানন্দের কবিতার বর্ণনার ভঙ্গী, উপমার কার্কুকার শব্দ ব্যবহারের শিল্প-সৌন্দর্য, ক্রিয়াপদের ব্যতীত ব্যবহার, চিত্রকলামূলক পরিচয়- যেখানে চাঁপাই দৃশ্যমান সাথে মিশে যায় রহস্য- ইমেজেশনিস্ট তথ্যে আঁকা ছবি ইত্যাদি বিষয়ে সুনীলের গুরুত্বপূর্ণ মূল্যায়ন রয়েছে। জীবনানন্দের 'ক্যাম্পে' কবিতাটির কাব্যভাষা বিষয়ে সুনীলের মত:

জীবনানন্দের প্রকিয়াটা সম্পূর্ণ অনারকম। তিনি এমন একটা কব্যভাষা আনতে চাইছিলেন, যার মধ্যে বিন্দুমাত্র সচেতন নেই। ... বাংলায় ক্রিয়াপদ ব্যবহার করলে এক্ষেত্রেকে এসে যায়, কবিতায় সেই জন্য শেষ শব্দে ক্রিয়াপদ এড়িয়ে যেতে হয়।

কিন্তু জীবনানন্দ যেন জের করেন 'ফেলীয়াচির মতন একটা এলানো ক্রিয়াপদ বসালেন। একটু পরে আবার লিখিলেন, 'বনের ভিতরে আজ শিকারীরা আসিয়াছে'- যেন বাণিজ্যিকির মতন প্রতিকৃতিগুলি বলে যাচ্ছেন। (সুনীল, ২০১৫ : ৩৬)

কখনও অর্থের আপাত সংযুক্তিবিহীন, পারস্পরিক পণ্ডিত্য ব্যবহার করে, কখনও শব্দের পারস্পরিক বৈচিত্রের ব্যবহার করে, যা মূলত উপমা বা রূপক নয়, ‘অচেতনের বহিঃপ্রকাশ কিংবা বিমূর্ত কাব্যরীতির প্রতিষ্ঠা করে জীবনানন্দ বাংলা কবিতার অকালীটিই বলে দিলেন।’ (সুনীল, ২০১৫ : ৩৭)। বিমূর্ত আর বিশিষ্ট কবিতার নদনাতিক এহংখ্যনেগ্রা বিয়োগ বিতর্কিত কিংবা কবিতায় সবসাধারণের সূচী, জীবনানন্দিয় বক্তাবরণ প্রতিকল্প, সাধারণ মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষার স্ব ইত্যাদি প্রসঙ্গে জীবনানন্দের কবিতার প্রকৃতি চিহ্নিত করেছেন সুনীল। কথা পালক থেকে বেরা অকেলা কালবেলা কাব্যপ্রেমের চায়ের জেলাই রূপপাত্র বিষয়ে মনোযোগ আকর্ষণ করেছেন তিনি। তাঁর কবিতায় সাবিত্রী অনুপ্রাণিত পাঠক সুনীলের প্রত্যায়:
এ রকম কবি যে কোনও দেশের বিষয়টি; তিনি মনে করেন বক্তব্যভাবাক্ত কবিতার দুর্লভতা এই, তা বারবার পড়তে ইচ্ছে করে না; অল্পক্ষণেই তার আকর্ষণ চলে যায়। ইস্তেহারের কিছু বক্তব্যধারন কবিতার বুদ্ধিকৃত কবির করেও কবি সুনীলের কাছে কোনো রচনার সার্থকতা প্রতিপন্ন হয়েছে শিশুদের ভোরে থাকা সাবলীল রহস্যের সঙ্গে- যা ক্রম উদ্ভিদ আকর্ষণ জন্য দেয়। তার মতে, “জীবনানন্দ দাশ একজন অতুলনীয় মায়াবী কবি!” (সুনীল, ২০১৫ : ৪৩)। সহস্র কাব্যাব্যোবেদনা দেখতে আর এই বিষয়বস্তু যা শিশুদের আনিষ্কৃতি রহস্যের কোলে, ভারতীয় ধ্রুপদী কাব্যাব্যোবেদনার অনুরণন হলেও জীবনানন্দ সম্পর্কে সুনীলের এই মুখ্যত তাঁর একাধার মত। সমালোচকের মতে “কথারা কি করে সমাহার সৃষ্টি করে তার শ্রীপূর্ণ দৃষ্টান্ত তাঁর কবিতা। কারণ মিশ্র ভাষার অন্তর্বাসী যেটিই তিনি অবেশ ঘনিয়ে তোলেন, এগুলোর দেহে বিষয়ে দেন হয়ের “নির্দূর আনন্দ”- তা রক্তের মধ্যে অবিরাম খোলা করে।” (অক্টোর, ২০১৮ : ১৪)।

ধূসর পাতুলিপি (সিগনেট সংস্করণ) প্রথম দেখতে কবি বিনয় মজুমদারের (১৯৩৪-২০০৬) মনে হয়েছিল ‘ধূসর শালপাতায় জড়িয়ে যেমন মাঙ্গ বিক্রি করে, ভেমনি দৃশ্যে ধূসর মলাটের মধ্যে কবির হৃদপিয়ে জড়িয়ে’ (বিনয়, ১৪০১ : ২৩৪) তাঁকে দেয়া হয়েছে।

কবি জানাচ্ছেন, কোনো কোনো কবিতা জীবনানন্দ দাশের মতে করে লিখতে চেয়েছিলেন তিনি, কিন্তু বহুবাঃ সংশোধনের পরেও তা স্থির হয়নি এবং মনে হয়েছে ‘জীবনানন্দকে নকল করা এত সহজ ব্যাপার নয়।’ (বিনয়, ১৪০১ : ২৩৪)।

জীবনানন্দের কবিতার নতুন ভাব অনুসারী পাঠ করেছেন কবি জহর সেনমজুমদার (১৯৬০- )। তাঁর জীবনানন্দ ও অঙ্ককারের চিন্তাও (প্র. প্র. ১৪০৫) গ্রন্থটি জীবনানন্দের কবিতা সমালোচনা উজ্জ্বল পূর্ণ সম্পূর্ণ। আবহমান কাল ধরে যে সত্তা বন্দর দিকে হেঁটে আসছে তার বিপুল শুরু তার নেই সঙ্গ কবির একাকি নয়; মানবের আবহমান জীবনানন্দের এই সত্যকে সম্প্রমাণ করেছে। জহর সেন কবিসত্যের বোধকে ব্যাখ্যা করেছেন এভাবে: ‘... জীবনানন্দের কবিতায় দেখা দিল ইন্দ্রিয় সংবেদী এক কল্পলজ্জৎ, যেখানে ব্যক্ত বা সত্তা গহনবাসী আবহমান বোধ আবহমান সময়-চেতনার মধ্য দিয়ে বৈশিষ্ট্য মানব-বিষয়ক বারবার ফিরিয়ে ফিরিয়ে আনে; অপরাহর সেই বোধ।’ (জহর, ১৯৯৩ : ১২)। অর্থাৎ সেই মানববিষয়ের কেন্দ্রস্থলে লক্ষিতকে থাকে 'দারুচিনি দীপ', অন্যদিকে 'লাশকাটা ঘর'। এই 'বাইনারি প্রজিশনকে' জীবনানন্দ মানবজীবনের সত্য হিসেবেই গ্রহণ করেছেন।
বৃন্দাকার অনুশাসন নেই যার (জহর সেন) কবিতায়, সেই কবির ভিন্নধর্মী আলাপনে পাই জীবনানন্দের কবিতায় বাবুক পত্র মোটিফেরও ব্যাখ্যা। তাঁর মতে:

তিনি অঞ্চলরূপ, সমাজরূপ এবং পৃথিবীরূপের গভীরে পৌঁছেছেন বিভিন্ন রকম জীবনকালের কবিতায় এবং জীবনকল্পের মাধ্যমেই তুলে ধরেছেন আমি-সত্তার বিভিন্ন মুদ্রা, বিভিন্ন সংকেত, বিভিন্ন কারুকার্য। ... জীবনানন্দ পরবর্তীকালে সেই একমাত্র কবি, যিনি জীবনকল্পের ভিতর দিয়ে আসলে নিজের ভিতরে নিজেই মন্ত্রণ পরিক্রমার এবং অন্যসংকেত থেকে আত্ম-অতিক্রমনের দিকে যাবার কাঠে বারবার আলো অর্ধকারে জীবনকল্পের আমোদ উপস্থিতিকে কবিতায় বিশেষ মাত্রায় ব্যবহার করেছেন। (জহর, ২০১০: ১৪৯)

খ.

পঞ্চাশের দশক থেকেই শুরু হওয়া বাংলাদেশের জীবনানন্দ-চর্চা অব্যাহত রয়েছে সমকালেও। জীবনানন্দ সমীক্ষণ (২০০০) গ্রন্থের ভূমিকায় সম্পাদক মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান লিখেছেন:

১৯৫৪ সাল থেকে ১৯৯৯- বিশ্ব শতাব্দীর দ্বিতীয়ায় ৪৫ বৎসরে জীবনানন্দ কবিতা ও পরে অন্যান্য অপকর্ষিত রচনা করে সমালোচনার নিবেদ পর্যালোচনার বিষয়ে পরিগত হয়। বাংলাদেশে এই আলোচনার জোয়ার আসে ১৯৬৪ সালে আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠ্য তালিকায় জীবনানন্দের কবিতা অন্তর্ভুক্ত করে পাঠন পাঠন শুরু করার পর। ... এ বিষয়ে প্রথম প্রবন্ধ লিখেন বাংলা বিভাগের প্রাক্তন ছাত্র বিশিষ্ট জীবনানন্দ-গবেষক অধ্যাপক অবদুল মাল্লান সৈয়দ ("সাহিত্য পত্রিকা", শীত ১৩৮৮, বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়) এবং বিশিষ্ট জীবনানন্দ-গবেষক, শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের তৎকালীন সহকারী অধ্যাপক ডক্টর ক্লিনটন সিলি (বর্ষা ১৩৮৯)

চালিশ-পঞ্চাশের দশকের কবি সমালোচকেরা জীবনানন্দের কবিতার সাহসী ও অভিনবতৃ সম্পর্কে মূল্যায়নধর্মী প্রশ্ন রচনা করেছেন। 'বাংলা কবিতার পটভূমিতে তাঁর অবস্থান নির্ণয়ের প্রশ্নের গল্পীয় মনোযোগের পরিচয়ে এ-সময়ের বেশ কিছু লেখায় সুপ্রস্তু হয়ে উঠেছে।' (রফিকউল্লাহ, ২০০১: ১১৭)। সৈয়দ আলী আহসানের (১৯২০-২০০২) 'আধুনিক বাংলা কবিতা: শব্দের অনুযায়ী', হাসান হাফিজুর রহমানের (১৯৬৫-১৯৮৩) আধুনিক কবি ও কবিতা (১৯৬৫) গ্রন্থে জীবনানন্দ দাশের কব্যালোচনা রয়েছে। এছাড়া গ্রন্থ বা প্রবন্ধ রচনা রয়েছে সুপ্রস্তুত। জীবনানন্দকে নিয়ে লিখেছেন কবি আবুল হোসেন (১৯২২-২০১৪, শামসুর রাহমান (১৯২৯-২০০৬), আহমদ রফিক (১৯২৯- ), মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান (১৯৩৬-২০০৮), বোরহানউদ্দিন খান জাহাঙ্গীর
(১৯৩৬-২০২০), বেলাল চৌধুরী (১৯৩৮-২০১৮), খালেদা এনিবার চৌধুরী (১৯৩৮-২০০৮), মোহাম্মদ রফিক (১৯৪৩- ), আবদুল মানন্দ সৈয়দ (১৯৪৩-২০১০), হুমায়ুন আজাদ (১৯৪৭-২০০৪), মাহবুব সাদিক (১৯৪৭- ), হুমায়ুন কবির (১৯৪৮-১৯৭২) প্রমুখ। এছাড়া কবি নন এমন জীবনানন্দ-সমালোচকের সংখ্যাও অনেক বেশি।

আবদুল মানন্দ সৈয়দ

আবদুল মানন্দ সৈয়দ (১৯৪৩-২০১০) ঘাটের দশক এবং পরবর্তী কালেরও একজন গুরুত্বপূর্ণ লেখক যিনি কবিতা, ছোটগল্প, উপন্যাস, প্রবন্ধ-গবেষণা, জীবনী, নাটক/কাব্যনাটক, স্মৃতিকথা, অনুবাদ-কবিতা, সম্পাদনা- সব ধরনের রচনাতেই দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। তিনি সবচেয়ে বেশি লিখেছিলেন প্রবন্ধ বা সমালোচনা- প্রবন্ধ; বিশেষত কবি ও কবিতা বিষয়ে তার রচনাগুলি ও বিচিত্র তুলনাহীন। বাংলাদেশের প্রধান কবিদের প্রায় সকলেই তার কলমে বিশ্বস্ত ও বিবেচিত হয়েছেন।

তার উল্লেখযোগ্য রচনা জীবনানন্দ দাশ বিষয়ক গবেষণা-প্রবন্ধ গুলিতে ছিল (১৯৭২)। 'আবদুল মানন্দ সৈয়দ বাংলাদেশে জীবনানন্দ-চর্চার ক্ষেত্রে একক প্রতিষ্ঠানের দায়িত্ব পালন করেছেন।' (রফিকউল্লাহ, ২০০১ : ১১৭)।
‘এক বিষয় ও সংবেদন জীবননন্দনকে আলাদা করে দিয়েছিল অন্য সবার থেকে’ বলে মনে করেন আবদুল মাল্লান সৈয়দ (মাল্লান, ২০০১ : ২২৯)। ‘প্রথম একটি জীবননন্দ মোহিতলাল-নজরুল-যতীন্দ্রনাথকে অতিক্রম করেছিলেন বিপুল জীবনময়তা ও মৃত্যুময়তা আর তাঁর সমস্ত শ্বাস-গ্রথম নিয়ে’ (মাল্লান, ২০০১ : ২৩০)। শুক্তম কবি গ্রহের বেশ কিছু নিবন্ধ জীবননন্দ দাশের কবিতার শারীরবৃত্তিক আলোচনা বলে (মাল্লান, ২০১১ : ১১) দাবি করেছেন মাল্লান সৈয়দ। একথা সত্য যে, কবিতা-সমালোচনায় বিষয়বস্তুভিত্তিক আলোচনার চেয়ে জীবননন্দের কবিতার রূপ- বিশেষত বর্ণ, ব্যবহার শব্দ (অক্ষর), অব্যাক্ত, হস্ত, রূপকরণ; এক কথায় কবর্দণার বিষয়ক প্রকরণধর্মী বিবেচনায় পুরোপুরি রয়েছে শুক্তম কবি গ্রহে। কেন শুক্তম কবি অভিধান-সে ব্যাপারে ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে সুঁচিয়েছেন জীবননন্দের কবিতা সম্বন্ধীয় চিন্তা বা বিশেষ কবিরুটির ভেতরে। মাল্লান সৈয়দের মতে, এই শুক্তম কোনো কল্পনায় শুক্তম নয়, বরং ‘কবিতা রয়েছে ব্যাপার’ বলে জীবননন্দ রসবিশিষ্টতাকে কবিতার আদি শুক্তম অর্থে প্রযোজ করেছেন। (মাল্লান, ২০১১ : ১৯)। কেবল আনন্দ, সৌন্দর্য ও শিল্পনাসমূহ কবিতার সৃষ্টিতত্ত্ব নিয়ে জীবননন্দধর্মী এই কাব্যরচনা নানা ব্যাখ্যা সমালোচনায় আছে; মাল্লান সৈয়দের অবশ্য গুরুত্ব দিয়েছেন জীবননন্দের কবিতার কথা গ্রহের কয়েকটি উদ্দীপকে; বিশেষত সাংবাদিকী ও প্রচারকর্মী চর্চায় সাথে কবিতার পার্থক্যের নির্দেশ করে কবি লিখেছিলেন যে ‘...প্রথমকালে জিনিশগুলোর ভিত্তির অভিজ্ঞতা-বিশ্লেষিত ভাবনা-প্রতিভার মুক্তি, ধ্বং ও সংহতি কিছুই নেই, কবিতার তা আছে।’ (জীবননন্দ, ২০১৭ : ১৭।) কাব্যচিত্র ও কবিতার অনুপ্রেরণা জীবননন্দ সমকল্লে কী করে আলাদা হচ্ছিলেন, সমালোচক মাল্লান সৈয়দ তা চিহ্নিত করেছেন পরিভাষাপ্রদকারী কবির কম-রূপকরণের যাতার ইতিহাস ধরে। কবির কল্পনাধর্মী কীভাবে কাজ করে, মনন-আবেগের সক্রিয় সে উদাস ব্যাখ্যাত হয় মাল্লান সৈয়দের কবিত্তেও:

ইতিহাস-তুল্যগুলোর স্পুষ্ট ডামন তাকে (জীবননন্দধর্মী) অর্থবানে আচ্ছন করে রেখেছিল ‘রৌদ্রে রক্তে অক্ষান্ত সকাল!’ উত্তরবৃত্তাকে তিনি প্রধান সম-সমাজ-দেশ-কাল ভাবনায় নিজেকে নিঃসৃত করেছেন, যার সূচনা তারার ভিতর থেকে।

এই ইতিহাসতুল্যগুলির জীবননন্দধর্মী আর এক স্পুষ্টরূপে উদ্দীপনা করেছিল, অথবা স্পুষ্টরূপে সাহায্য করেছিল সেই লোকে যেতে, যে-স্পুষ্ট যুগ-এর উচ্চারণে 'ব্যাক্তি-মানুষের মিথ'। ... তার কবিতায় এই স্পুষ্টতা একক কার্যকরী যে, তার সময়ের মুক্তিগ্রহিত নয়, বরং স্পুষ্টসমাহত। - জীবননন্দের কবিতায় এইভাবে কাজ গেছে বিচিত্রবিধি কল্পনার অপরাপর অর্ক্টস্যায়ন। (মাল্লান, ২০১১ : ১৩১)

সময়-ইতিহাস পরিভাষামূলত প্রতোকে কবিতা ব্যৈষুটিয়ি বলে জ্ঞানান মাল্লান সৈয়দ- 'প্রতোকে কবি নিজের ভেতর দিয়ে একক মানববাহিত আদ্যতাত্ত্বিক কাল পরিভাষণ করে।
আসেন; অতিজাগতিক ও মহাসময়বাহী একটি পৃথিবী কবর ভিতর দিয়ে অতিবাহিত হয়ে যায় যেন।’ (মাল্লান, ২০১১ : ৩৭)। এ অভিযাত্রিকতা এক অতিশীতোষ্ণ মত; যা জীবনানন্দকে দিয়েছে পরিশুদ্ধ আবেগের দ্যেতান। জীবনানন্দ সমীক্ষণ মাল্লান সৈয়দ তুলনামূলক সমালোচনা করেছেন রবীনন্দন, নজরুল, মোহিতলাল, সমকালীন অনেক ইংরেজ কবর সাথে। বিচ্ছিন্নভাবে প্রত্যাক্ষ পরামর্শ আলোচনার পরেও প্রাতিষ্ঠানিকটাই মৌল অবলম্বন হয় শিল্পী; যে ‘প্রাতিষ্ঠানিক বিজনতায়ই দ্বিতীয় অভিধা’ (মাল্লান, ২০১১ : ১২০) এবং নব এক প্রজ্ঞা যা একক ও অবিরত্ন নয়, কেবল কবর স্বতন্ত্র মর্ম ও প্রতিষ্ঠ। মাল্লান সৈয়দের স্বীকৃতিতে উচ্চারিত হয় কবিতার সংবেদনার সমাবয়ী দর্শন।

বাংলা কবরত্তালগে জীবনানন্দ দাশ প্রথম বিমূর্ততার বিশাল আকাশ মুক্ত করে দিলেন যেন আমাদের চেখের উপর থেকে কিশোর বহুযুগল একটি পর্যায় সরিয়ে ফেলে। সাম্প্রতিক পাঠক যে মধুপুর-রবীনন্দন-জগজ্জি-মোহিতলাল-মীরহাদুরের চেয়ে জীবনানন্দের কাব্যের আবাদ অধিক নিকটবীর্ণ পায়- চেনা অনুভূত ও অবিভিন্নতার আত্মন অনুভূত করে, তার কারণ অনেক এখানেই ; এ৷ কালের পাঠকের চতুর্দশর জমি থেকে তার কবিতা রচিত। ... কাব্যতাত্ত্বিক স্বাক্ষর পরিরক্ষামূল; যুগ-রূপ এই উচ্চ কেবল দেশ-কাল-সমাজের সমকালীন চাপেই তৈরি হয় না; তার পিছনে থাকে আরো বিচিত্রিক শিল্পসম্পর্ক চাপ, তারপর ও সুপরিচিত উভয় নব রূপের কাছে এসে জীবনানন্দের কাব্যক্ষেত্র ও কাব্যমূল পৃথিবী উপার্জন করে নিল; প্রায় নিম্নগুলো তিনি কবিতার মর্মপৃথিবী থেকে একটি বীরতি হাতুড়ি দিয়ে এতকাল-বাহিত অজ্ঞান পরিপ্রেক্ষ্যে যত-সব কাব্যগুলি ভেঙে দিলেন। (মাল্লান, ২০১১ : ১২১)

মাল্লান সৈয়দের সমালোচনা প্রায়ই এরকম ‘ইমপ্রেশনিস্টিক’ (বিশ্বধর্মী) রূপ ধারণ করেছে। তবে একজন দায়িত্বীল সং সমালোচকের মতই তিনিও অস্ত্রেশ ও মূল্যায়ন করেছেন জীবনানন্দের কবিতার আধ্যাত্ম ও প্রকৃতি- অন্তর্গত পাঠ অর্জন করে নিয়েছেন তাঁর কবিতার নানা অভিজ্ঞান। অনুভব করেছেন কী করে আধুনিক মানুষের আনরাজা মিশেছে তাঁর কবিতায়- ‘আজকের মানুষ পেয়েছে তার যশ্চার ছবি, কিন্তু একই সঙ্গে আনদের চিত্র।’ (মাল্লান, ২০১১ : ৩৩৮); কিংবা বিশেষ দেশকালের পরিষ্কার-প্রতিষ্ঠিত-মধ্য দিয়ে কবি পৌছান মানবিকতার বোধে- ‘মানুষের মৃত্যু হলে/তবুও মানব থেকে যায়’- এ কোনো শাস্ত্রীয় নয়, নয় পড়ে-পাওয়া কোনো বিষয়- ‘জীবনানন্দের কবিতা শেষপর্যন্ত দৃষ্টমাত্র পরিবেশনের উপরে উঠে গিয়ে মানবতার জয় ঘোষণা করেছে।’ (মাল্লান, ২০১১ : ৩৪৩)। অতিসংবেদী কবির লেখায় দৃঢ়ময় নৈরাজ্য, নির্জন নৈসর্গিক সুপ্রচুর অস্ত্রকার আর অপরিভাবনী মৃত্যুচেতনার সমান্তরালে প্রকৃতিতে হয়। ‘ব্যক্তিমানুষের মৃত্যুর পরেও মানবের ধারাবাহিততায় আস্থা স্থাপন করেছিলেন তিনি।’ ‘মহাজিজ্ঞাসা’ কবিতার উদ্দৃতি দিয়ে মাল্লান সৈয়দ লিখেন-
‘রেডিওতে পঠিত সর্বশেষ কবিতায় (‘মহাজিজাসা’) উচ্চারণ করেছিলেন ‘ইতিহাস অবিরল শূন্যের গ্রাস– যদি না মানব এসে তিন ফুট জাগরিত কাহিনীতে হদয়ের নীলাভ আকাশ/ বিছিয়ে অসীম করে রেখে দিয়ে যায়’; জীবনানন্দের কবিতা সেই তিন ফুট অসীমের জর্জরণ। জন্ম আর মৃত্যু দুই কালো সাগরের মাঝখানের শ্যামল ভূঃখে এক অবিনাশ মহাত্ম।’ (মাল্লন, ২০১১ : ৩৩১)।

গুরুত্বম কবি এই জীবনানন্দের কবিতার একাংশ একককার্যকরে সমালোচনার অনেক বেশি। কবিতায় পরবর্তী চিত্রকর্ম ব্যবহার কিংবা বনলতা সেন ও মহাপুরুষী কাব্যগ্রন্থের কয়েকটি পরবর্তী কবিতা সম্পর্কে মাল্লন সৈয়দের বক্তব্য হল– আপাত দৃষ্টিতে অল্প, পরম্পরাগত মন হলো পুরো কবিতা পড়ে উঠে একটি অভিযাত্রের সামগ্রী সৃষ্টি হয়। আদেশে এতো যথে বলছিলেন ‘Marvellous’, জীবনানন্দ যাকে বলছেন ‘আপাত্বিশ্বস্য’, ‘জীবনানন্দের এই সব কবিতা তারই কারণে হয়ে ওঠে আনন্দ আধার ও কান্তিন্দ্রিতেন’। (মাল্লন, ২০১১ : ১২৯)। জীবনানন্দের অরিজল উপমা প্রয়োগকে ‘দৃষ্টিগৃহ’ ও ‘আত্মিক’ দুই রকমের মন হয়েছে সমালোচকের, এছাড়া শব্দ ব্যবহার ‘অবুদ্ধপদ, গীতালতা, চিত্রলতা’র কম পূর্ণতা কেবল মহিৎসময় প্রভাবের ফল নয়, ‘কবির অন্তঃসময় সম্পাদীত’। (মাল্লন, ২০১১ : ৩৮)। মিল, অনুপ্রাস, ছন্দ, পুনর্গুণ্ঠ, বিকল্প শব্দ ও বাক্য ব্যবহার কিংবা ‘অবিরল শব্দ পাত্তি-স্ববক পরিবর্তনে পরিশোধনে তার নিগূঢ় জটিল বহুমাত্রিক মনসের অনেকক্রম আলোচ্যায়র সম্পাদ্য কাজ করে যায়। (মাল্লন, ২০১১ : ৩৫৫)। ক্রিয়াবচ্ছেদ শব্দ ও বিশেষণ শব্দের নতুন ও বিস্ময়কর ব্যবহার করে জীবনানন্দ মনে ‘বাংলা ক্রিয়াপদের দীঘা মনে খানিকটা ঘুরচিয়ে দিয়েছিলেন’। (মাল্লন, ২০১১ : ৪৪৪)। বিশেষণ ব্যবহারের নানা উদাহরণ টেনে সমালোচক সেই দ্রষ্টব্যকে অভিহিত করেছেন ‘প্রাণাশিত ও চেষ্টাধারানে’, একত্রক-ভার্ত্ত বাংলা কবিতাবিশেষ মজিকের মতো, নিস্থাত ও অচ্ছন্ন, কুশলী ও অনুগত প্রয়োগ।’ (মাল্লন, ২০১১ : ৪৬৪)। মাল্লন সৈয়দ চিত্রিত জীবনানন্দীয় বিশেষণের একক একটি উচু ওঞ্চ:

1. হলুদ লতার গঙ্গে ভরে ওঠে অবিচল শালিকের মন [‘সিদ্ধোসারস’, মহাপুরুষী]

2. ঠাই ভূমে গেলে পরে প্রধান আধারে তুমি অশেখরের কাছে একঘাঁটা দড়ি হাতে গিয়েছিলে তবু একা-একা। [‘আট বছর আগের একদিন’, ঐ]

3. আরো-এক বিপল্ল বিস্ময় [ঐ]

4. একটি বাদুর দূর রোপর্জাত জ্যোতিব্রানা মনীষায় ডেকে নিয়ে যায়। [‘কবিতা’, সাতটি তারার তিমির]


৫. সূর্য অস্ত্র চলে গেলে কেমন সুকেশীর অগ্নিকার যৌপা বেঁধে নিতে আসে। [১৯৪৬-৪৭, শ্রেষ্ঠ কবিতা]

৬. আজ ধোংকে আছে তার চিন্তা আর জিজ্ঞাসার অগ্নিকার যুদ্ধ। ['ধান কাটা হয়ে গেছে', বনলতা সেন]

জীবননন্দের কবিতায় ব্যবহৃত এরকম সূত্রচরি বিশেষণ যা কখনও মানসলোকী, চিত্রীল, কখনও বর্তীলোকস্থী, কখনও রহস্যময় অপর অর্ধদৃষ্টনা বহনকারী বা অন্তর্লোকবিহারী- মাননীয় সৈন্যের যত্নবান সমালোচনায় জীবননন্দের কবিতালোকের বিশেষ ও নতুন শব্দায় আবিশ্রুত হয়েছে কবিতার নানা অধ্যয়নে অভিজ্ঞতায়। তাছাড়া, 'কবিতা বিশেষণে উপযোগী নিজস্ব পদার্থীতি উদ্ভাবনে সমর্থ হয়েছে তিনি।'(রফিকউল্লাহ, ২০০১ : ১১৮)। সমালোচক যেন তাঁর কবিতামূলক রুপাগমন করে নিতে পেরেছিলেন, কবিতা প্রথম সংবেদনায় জীবননন্দের কবিতায় কুশলী পাঠ কবিতাগুলোকে যেন আপনি কৃতজ্ঞতা করে তোলে।

জীবননন্দী-শায়রের প্রকৌশল ও সৃষ্টি উপমাকে অত্রুৎপত্তি পাঠে নানা বিশেষণে আখ্যায়িত করেছেন হুমায়ূন আজাদ (১৯৪৭-২০০৪)। পাঠকের ইতিহাসচতুর্যায় ‘অপরিসীমীর বিস্তৃতি’ নিয়ে আসে যে উপমাগুলো তা ‘নতুন, নিজস্ব, সুদৃশ্যস্বীকারী, আড়া যা যখন প্রচলিত, তখন তার মধ্যে এমন মায়াবি স্পর্শ থাকে, যা একাকার জীবননন্দ দাশই দিতে পারেন।'(হুমায়ূন, ২০০৫ : ৬৮)। কবিতার প্রধান শক্তি হিসেবে উপমার উপরুট্ট জীবননন্দের সৌভাগ্যে দিয়েছেন, তা তাঁর শব্দ ব্যবহারের কল্পনাকৌশলের ক্ষেত্রেও প্রয়োজন। হুমায়ূন আজাদের মতে:

তাঁর কবিতা পরম পিপাসী স্বপ্নচারিতা, এ-স্বপ্নচারিতায় যা সহায়ক, সে-শব্দ তিনি আহরণ করেছেন, সৃষ্টি করেছেন, ভেঙেছেন, পুনর্সৃষ্টি করেছেন। এর ফলে গঠিত হয়েছে তাঁর একাকাম নিজস্ব শব্দস্তুলোকী, নিসর্গের প্রতিটি সমার তাঁর, বিশেষের মোহীয়তাও তাঁরই। (হুমায়ূন, ২০০৫ : ৬৪)

মাহুব সাদিকের (১৯৪৭-) জীবননন্দ: কবিতার নান্দনিকতা (২০০৪) প্রশ্নেও রয়েছে জীবননন্দের কবিতায় সমকাল, ইতিহাস-চেতনা, নারী, পুরুষ ভাবনা; রয়েছে চিত্রকলা, রং, শব্দের ব্যবহার সম্পর্কে প্রাকরণমূলী আলোচনা এবং জীবননন্দের কাব্যে ব্যবহার পুরাণের সার্থকতা প্রশ্ন:

জীবননন্দ দাশ, সূর্যোদয়কাল, বিষ্ণু কপাল ও বৃদ্ধসেন বনীতের কবির মধ্যে এই চারজন পুরাণ প্রয়োগের পারস্ম। জীবননন্দ দাশ পুরাণ ব্যবহারে শ্রুতি অসাধারণ নৈপুণ্যেই দেখাননি, তাঁর কবিতায় পুরাণের সঙ্গে প্রযুক্ত হয়েছে লোকপুরাণ ও ইতিহাসচেতনা। ... পুরাণ প্রয়োগের মাধ্যমে দিয়ে শান্ত মানবজীবনের সঙ্গে সম্পর্কিত হয়ে তাঁর কার্যকলা সমৃদ্ধ হয়েছে। (মাহুব, ২০০৪ : ১৮৯)
কবি হুমায়ুন কবির (১৯৪৮-১৯৭২) ‘জীবননদন্দের কবি’প্রকৃতি’, ‘সাম্প্রতিক জীবনচেতনার পরিপ্রেক্ষিতে জীবননদন্দ দাশর কবিতার রূপরেখা’-সহ বেশ কয়েকটি প্রবন্ধ রচনা করেছেন। ‘জীবননদন্দের কবি’ প্রবন্ধে হুমায়ুন কবির চিহ্নিত করেন জীবননদন্দের সৌন্দর্যপিপাসা রোমান্টিক মন; তুলনা করেছেন সমসাময়িক বিভিন্ন কবির সাথে, আবিষ্কার করেছেন জীবননদন্দের প্রেম, প্রকৃতি, দেশান্তরোধ, মানবিকতার বোধ।

তার মতে, ইতিহাস-ঐতিহ্যের প্রতি কবির অনুরাগের ধরন, নাগরিকতার চেতনা- সবই প্রায় সত্যত ঘরে উদ্বোধিত।

কবি শাহাবুদ্দিন নাগরীর (১৯৫৫- ) মতে, “জীবননদন্দ দাশর সত্যই ছিল সবমানুষের কল্যাণ ও মুক্তি। ... নদিত শব্দের প্রতি জীবননদন্দ অবহেলা দেখানি এ যেমন সত্য কথা, তেমনি সত্য তার কাব্যের নির্গতার ভেতর দিয়ে তিনি কামনা করেছেন মানবজাতির মঙ্গলের। এই মঙ্গলচিত্তই পরিবর্তিত হয়ে জীবননদন্দের জীবনে মানবধর্ম এবং পরিশেষের ধর্মচিত্ত হয়ে দাঁড়িয়েছে।” (শাহাবুদ্দিন, ২০০১ : ২২০)।

জীবননদন্দ দাশর কব্য-সমালোচনায় কবি নন, এমন বিদ্বেষ সমালোচকের সংখ্যাও অনেক। অধুনিক বাঙালি কবিদের মধ্যে জীবননদন্দ দাশ সম্পর্কিত সমালোচনা-এর সবচেয়ে বেশি, রয়েছে অসংখ্য সমালোচনামূলক প্রবন্ধ-রচনাও। উল্লেখযোগ্য সমালোচনার হলেন অশোক মির, কুকুমার মুখোপাধ্যায়, অমৃত বসু, অশোক কুমার সিকড়ার, অরুণ সেন, আলেন্দু বসু, প্রভাতকুমার দাশ, উজ্জ্বল মুখোপাধ্যায়, দীপটি ত্রিপাঠী, প্রলুভ মিত্র, বাসুদেবী মুখোপাধ্যায়, শিবাঙ্গী বন্দ্যোপাধ্যায়, সুমিতা চক্রবর্তী, তরুণ মুখোপাধ্যায়, সুতপা ভট্টাচার্য, সুতাপী ভট্টাচার্য, হিমবত বন্দ্যোপাধ্যায়, অশোক মির, ক্লিরটন বি. সীলি প্রমুখ। বাংলাদেশে জীবননদন্দের কবিতা বিষয়ে গ্রীষ্ম বা প্রবন্ধ/নিবন্ধ রয়েছে আবদুল হাফিজ, রণশ দাশগুপ্ত, সীরাজুল ইসলাম চৌধুরী, যতীন সরকার, সন্ত্রকুমার সাহা, আহমদ চৌধুরী, আবুল কাসেম ফজলুল হক, বেগম আক্তার কামাল, সিদ্দিকা মাহমুদা, অনীক মাহমুদ, নেফুত আসগার, ফয়জুল লতিফ চৌধুরী, আসাদুজ্জামান, সৈয়দা আরিন জামান প্রমুখের। জীবননদন্দের জগন্নাথবর্ধে বাংলা একাডেমি কর্তৃক নিবেদিত পত্রিকা ‘উত্রালিকার জন্মপত্তন সংখ্যা (গ্রিল-ডিসেম্বর ১৯৯৯)’ রয়েছে গুরুত্বপূর্ণ অনেক রচনা। তাছাড়া পশ্চিম বাংলা ও বাংলাদেশের বিভিন্ন ‘লিটল ম্যাগাজিন’ বিভিন্ন সময়ে প্রকাশ করেছে জীবননদন্দ সংখ্যা।

জীবননদন্দের কবি-মানস ও কব্যাসাধনার প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলোসহ উক্ত সমালোচকদের লেখায় বিশ্লেষিত হয়েছে তার কব্যে প্রকৃতিচেতনা, প্রেম, ইতিহাস-ঐতিহ্য, সমাজ-চেতনা, পরাবাসবতা, সমকাল-সামাজ এবং কব্য-প্রকাশের বিভিন্ন দিক যথা- চিত্রকলা, উপমা-শব্দ-ছন্দ এবং প্রধান বেশ কয়েকটি কব্যগ্রন্থের ও কবিতার বিষয়ে আলোচনা।
জীবননন্দনের কাব্য-সমালোচনায় কবিদের সমালোচনা-কৃতি এই অনুভব জাগায় যে, 
কবির মর্মান্তিক উদ্যানে তাঁরা কেউই বার্তার নন। জীবননন্দন লিখিতেছিলেন: "যাঁদের 
মন কবিতা-মূর্তির জন্য তৈরি নয়, কাব্য-আচরণায় তাঁরা পরিচিত হবে না, পাতিত্য, ভাষা 
অন্তঃপ্রবেশ দেখতে পারলেও কবিতা সমধ্যে তাঁদের বোধ, আমার ভয় হচ্ছে শেষ 
গভীরতা লাই করতে গিয়ে প্রায়ই বার্তা হয়, বিশ্লেষণ হয়ে পড়ে।" (জীবননন্দন, ২০১৭:৮৩)। 
সমালোচনাতে বিশেষত কবিতার নদনভাষিক বিচারসূচী ‘নিকরি গদ্য-
সমালোচকের’ অজর দৃষ্টি কিংবা নির্মাণক্ষম প্রজ্ঞা বিষয়ে জীবননন্দনের নির্দেশ বীরকরভট্টি 
রয়েছে, তবে তিনি কবিতা সমালোচনায় কবির উদ্যোগকেই স্বাগত জানিয়ে আরো 
লিখেছেন: "...কবিতা সমধ্যে বড়, সত্যাবী আচরণ কবিরদেরই করা উচিত- সৎ 
কবিদেরই নিজেদের অনুভূতি ও চিত্তার কবিতাভাবের প্রয়োগ থেকে তাঁদের খুলে নিয়ে 
অনা প্রয়োগে- কবিতা সমক্ষে আচরণায়-মাঝে মাঝে নিয়োজিত করা দরকার।" 
(জীবননন্দন, ২০১৭ : ৮৯-৯০)। নিজের বা অন্যের কবিতার ব্যাখ্যা হিসেবে কবিকে 
প্রয়োজনীয় মনে করার পেছনে সমকালে জীবননন্দনের কবিতার প্রতি বিরুদ্ধ প্রতিক্রিয়া, 
অন্বেষণ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ও পরিদর্শিত হিসেবে কাজ করে থাকতে পারে। যে 
অভিজাত কবিতার জন্য দরকার, 'কবির সেই জনপরিসেবার গভীরতার ও যুক্তি-
আলোকিত দ্বিতীয় বর্ণনা' (জীবননন্দন, ২০১৭ : ৮৯-৯০) অর্থাৎ সমালোচক-সমুদ্রের 
এ চিত্রায় নিষ্পুষ্ট দেখতে চান জীবননন্দন। মূলত, অপসমালোচনার ক্ষতি এড়াতেই 
এমনটা কামনা করেছিলেন তিনি। একজন কবির সৃষ্টিশীল চিত্রের অমূল্য বিভাগ, 
মুন্ডা- যা একজন সমালোচক বা সাধারণ পাঠকেরও আছে কিংবা আছে তীক্ষ 
বিচারবুদ্ধিসম্পন্ন বিশ্লেষণের বোধ। কবির সংবেদনায় জীবননন্দন আবিষ্কার আর 
সমালোচকের প্রাতিষ্ঠানিক ভঙ্গির জীবননন্দন চর্চায় একটি পার্থক্য ঘটেই যায়, যদিও 
সবক্ষেত্রে তা সত্য নয়। জীবননন্দনের রহস্যময় কবিতাভাবের আত্মজ্ঞ নিজের পাঠেই 
অধিক নান্দনিক আনন্দ খুঁজে পেয়েছেন কবির। ফলে কবির পাঠে কেঠাও কেঠাও সে 
অবলোকন হয়েছে 'ইমপ্রেশনিস্ট', যেভাবে সমালোচনা হয়ে ওঠে নব সৃষ্টিতে 
আনন্দময় নির্মাণ। এভাবে 'কবি কিংবা ঔপন্যাসিকের মধ্যে জীবননন্দন বিষয়ক 
আবিষ্কার ঘটেই চলেছে'- (দেবেশ, ১৯৯৬:১৪৮)। তাই কবি জীবননন্দন নির্মিত হতে 
থাকেন; তাঁর ইতিহাস পরিকল্পনা, দেশ-কাল সংলগ্নতা কিংবা বিচিত্রতার ভিত্তির 
ব্যাখ্যাতার সেই দৃষ্টিতে গৃহীত হয় তাঁর ব্যবহৃত শব্দ, চিত্রকলা, উপমার নব নব সৃষ্টিল-পাঠ। 
কবি যেভাবে জীবননন্দনকে পড়েন, সেটা বেশিরভাগই কবিতার দিকে কবির অভিধাত্র 
সঙ্গী হবার মতন, কবিদ্বারা ব্যাপকতায় আকৃতি পাওয়া শিল্পের অনুভব যেখানে প্রবল। 
কবির জীবনদর্শন, প্রতীক, ইতিহাসচেতনা ও ঐতিহ্যবাদ, নবতর মানবচেতনা,
জীবনসত্ত্বের পরিবর্তিত মাত্রা ও রূপ প্রভূতি কেন্দ্রীভূত হয়ে আছে তার কবিতাতেই, কবিকৃত সমালোচনায় এই বোধগুণেকে জীবনানন্দের কবিতায় সংরক্ষিত এক সমগ্রতা হিসেবে আবিষ্কারের প্রচেষ্টা রয়েছে। জীবনানন্দের খোঁট পাঠ-ও সে কারণে কাম্য নয় অনেকের কাছে। কবিরা তাঁর সে চেতনাজগত থেকে নিয়েছেন দীক্ষা। সমকালে যে মুদ্রাদোষ কবিরা আলাদা করেছিল এবং যে কারণে কবি হয়েছিলেন প্রত্যাখ্যাত, উত্তরকালে জীবনানন্দের কবিতার মূল্যায়নে মূর্তি, ব্যাখ্যার, নিরাখাসের, ক্রান্তির, জীবন-উৎক্ষেপ, ক্ষয়ের কবি হিসেবে তাঁর একটি সহজ পরিচয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। কিন্তু সমালোচক-কবিদের কেউ কেউ জীবনানন্দের এই অপূর্ব-খোঁট পাঠে অপবীত করেছেন। অন্তর্ভুক্ত ও অপরিভাবনী জিজ্ঞাসায় নয়, বরং চেয়েছেন চিন্তালীনের পটভূমিকায় সমসাময়িকের প্রতিচ্ছবি হিসেবে তাঁর কাব্যে চিহ্নিত করতে। এছাড়া তিরিশের দশকের আধুনিক সাহিত্যে যে প্রমাণের বিদ্রোহ দেখা দিয়েছিল সময়, সমাজ-জীবন, দর্শন ও সম্পর্কের ব্যাখ্যা; সেই দিকটা গুরুত্ব দিয়ে জীবনানন্দের কব্য-চিত্রা থেকে কবিরাও চেয়েছেন ক্রম-পরিবর্তিত ও রূপান্তরিত সময়ের অভিজ্ঞাতায় তাঁর/তাঁদের শিক্ষা-নির্মাণকার্যের প্রভাব, প্রভৃতি কিংবা সাতাধ্যেকে মিলিয়ে নিতে। কাব্য নির্মাণকাল বা শৈলী বিচারে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কবিরা টুকোরা বিশেষণের চেয়ে কবিতার উপলব্ধির বিষয়টি গুরুত্ব দিয়েছেন অনেকে বেশি। জীবনানন্দের ব্যবস্থাপনা অক্ষর, শন্ধ, বিশেষণ, অব্যাক্ত কিংবা ক্রিয়াসমূহের ভাব ও অর্থজ্ঞাতকতার নির্ধারণে প্রাপ্ত শৈলীবিদার্শীদের মত সূক্ষ্ম বিশেষণে কেবল ছাড় করেছেন কেউ। কিন্তু সর্বপ্রতি সমালোচকের নিবৃত্তি অধ্যায়ের সংলগ্ন-মূল্য পাঠ-ই মূর্ততা ও বিমূর্ততা নিয়ে ব্যাখ্যা গেয়েছে। জীবনানন্দের কবিতায় কখনও পারস্পরিকভাবে পত্তিকা কিংবা ব্যবহৃত এমন শন্ধ যা উপমা বা প্রকৃত নয়, তেমন ক্ষেত্রে সময় ও উপলব্ধির কিংবা অর্থের সূক্ষ্মতার যোগসূত্র নির্ধারিত হয়েছে সমালোচনায়। এভাবেই জীবনানন্দ দীর্ঘ সময় ধরে কবিরুপের বিশেষত তরুণ কবির আরাধ্য হয়েছে। বাংলা কবিতার একটা বড় অংশ অনেকটা সময় ধরে জীবনানন্দের ধারায় প্রবর্তিত হয়েছে। জীবনানন্দ যেন আধুনিক সময়ের রোমান্টিকতার ভাব ও মতাদর্শকে কাব্যরূপে 'হুপপল্ডি' করে তুলেন; ফলে আধুনিক ও আধুনিকতার সময়ে তাঁর কাব্যভাবনা, কাব্যবিদ্যার সংবেদনশীল পাঠকের কাছে শেখার্থী মূর্ততা, বিস্ময় ও রহস্যময়তার উৎস ভূমি হিসেবেই থেকে যায়।

প্রশংসা
অলোকরক্ষণ দশাগুণ (২০০৭)। জীবনানন্দ। দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা।
আবদুল মানন্দ সৈয়দ (২০০১)। 'বৃত্ত যেভাবে সম্পূর্ণ হল।' জীবনানন্দ দশ জনমুক্তবার্ষিক অর্কঞ্জু [সম্পাদক: আবদুল মানন্দ সৈয়দ ও আরুল হাসীনাত], অবসর, ঢাকা।
আবদুল মাননা সৈয়দ (2011)। জ্ঞাত কবি। পাঠক সমাবেশ, ঢাকা।

জহর সেনজুমদার (1999)। জীবননাদন ও পদচিহ্নয় অপ্রতিক্রিয়। পাঁচোপলি, কলকাতা-৭৩।

জহর সেনজুমদার (2010)। ‘আজকের জীবননাদন, কলকের জীবননাদন’। জীবননাদন দাশ মূল্যায়ন ও পাঠাঙ্গার [সম্পা. আবু হোসেন শাহীরায়], সাহিত্য বিকাশ, ঢাকা।

জীবননাদন দাশ (2017)। কবিতার কথা [সম্পা. ফয়জুল লতিফ চৌধুরী], বাংলা একাডেমি, ঢাকা।

দেবেশ রায় (1996)। ‘অন্য এক আরম্ভের অপেক্ষায়।’ এই সময় ও জীবননাদন [সম্পা. শঙ্খ ঘোষ], সাহিত্য অকাদেমি, কলকাতা।

পূর্ণচন্দ্র পাটী (1401)। সরা পালক আবার। কোরক সাহিত্য পত্রিকা [সম্পা. তাপস সেহেমিক, সৌদর বন্দ্যোপাধ্যায়, পার্থ রায়বর্মন], জীবননাদন সংখ্যা, কলকাতা-৫৯।

গ্রন্থাবলীর দাশ (2008)। ‘প্রতিকৃতি ও কবিরতা-র উজ্জ্বল অধিনায়ক: বুদ্ধিবৃন্দ বসু।’ বুদ্ধিবৃন্দ বসু: সঙ্গ-প্রসঙ্গ [সম্পা. গৌরঘনক বন্দ্যোপাধ্যায়], পহেলিখা, কলকাতা।

বিনয় মজুমদার (1401)। জীবননাদন ও আত্ম: কিছু অসংঘর্ষ ভাবনা। কোরক সাহিত্য পত্রিকা [সম্পা. তাপস সেহেমিক, সৌদর বন্দ্যোপাধ্যায়, পার্থ রায়বর্মন], জীবননাদন সংখ্যা, কলকাতা-৫৯।

বুদ্ধিবৃন্দ বসু (1997)। কাব্যের পুরুল। নিউ অ্যাপ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিটি., কলকাতা।

বেগম আকৃতার কামাল (2018)। জীবননাদন: কথার গ্রন্থ কবিরতা। কথাপ্রকাশ, ঢাকা।

মাহবুব সাদিক (2004)। জীবননাদন: কবিতার নাল্লানটিকা। নবর্ণ, ঢাকা।

রফিকুদ্দোলাহ খান (2001)। ‘বাংলাদেশে জীবননাদন-চর্চা।’ জীবননাদন দাশ জনুষ্ঠানবর্তী স্মারকগুলো [সম্পা. আবদুল মাননা সৈয়দ ও আবুল হাসানী], অধ্যায়, ঢাকা।

শঙ্খ ঘোষ (1405)। জীবন মৃত্যুর শঙ্খ ঘোষ। বিভাগ [সম্পা. সমরস্থ সেনগুপ্ত], জীবননাদন দাশ জনুষ্ঠানবর্তী সম্মান সংখ্যা, কলকাতা।

শঙ্খ ঘোষ (2014)। ‘সময়ের সম্প্রতি।’ জীবননাদন দাশ মূল্যায়ন ও পাঠাঙ্গার [সম্পা. আবু হোসেন শাহীরা], সাহিত্য বিকাশ, ঢাকা।

শামসুর রাহমান (2001)। ‘আসীমের সেক্রেটের।’ জীবননাদন দাশ জনুষ্ঠানবর্তী স্মারকগুলো [সম্পা. আবদুল মাননা সৈয়দ ও আবুল হাসানী], অধ্যায়, ঢাকা।

শাহাবুদ্দীন নাগরী (2001)। ‘জীবননাদন: উভয় প্রজমন্যের কবি।’ জীবননাদন দাশ জনুষ্ঠানবর্তী স্মারকগুলো [সম্পা. আবদুল মাননা সৈয়দ ও আবুল হাসানী], অধ্যায়, ঢাকা।

সমীর সেনগুপ্ত (2008)। বুদ্ধিবৃন্দ বসুর জীবন। বিকল্প, কলকাতা।
সুজিত সরকার (১৪০১)। জীবননন্দের প্রভাব। কোরক সাহিত্য পত্রিকা (সম্পা. তাপস ভৌমিক, সৌরভ বন্দ্যোপাধ্যায়, পার্থ রায়বর্মণ), জীবননন্দ সংখ্যা, কলকাতা-৫৯।
সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় (২০১৫)। আমার জীবননন্দ আবিষ্কার ও অন্যান্য। মাটিগঙ্গা, ঢাকা।
ফ্রেডারিক হুমায়ুন আজাদ (২০০৫)। আধার ও আধেয়। আগামী, ঢাকা।